অচিন সাধক

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

[নিবোধত-য় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত 'প্রচলকথা'র গল্পগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে, যা পাঠকমহলে অত্যন্ত সমাদৃত। অগণিত পাঠকের বারংবার আবেদনে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আবার 'প্রচলকথা' আরম্ভ হল।]

মা নর্মদার তীর সাধু-মহাত্মাদের সাধনমন্দির। নর্মদার জলরাশি যেন দেবলোক ও মর্ত্যলোক ছুঁয়ে বয়ে চলেছে। সেখানে সাধন করতে করতে পুণ্যাত্মা অজ্ঞাতসারেই হয়ে ওঠেন মহাত্মা। আজ তেমনই এক কাহিনি বলতে চলেছি। মানুষের মুখে মুখে সে-কাহিনি এসে পৌঁছেছে শ্রুতিপথে।

সে বহুদিনের কথা। নর্মদার কূলে খেলা করত ছোটছোট ছেলে। তাদের ভয়ডর ছিল না। তাদের দলপতি ছিল সাহসী মিহিরা। নর্মদা মায়ের সঙ্গেই তাদের বেড়ে ওঠা। সেখানকার পথঘাট, পরিক্রমার সাধুদল ছিল তাদের পরমাত্মীয়। সাধু বা পরিক্রমার পথিককে তারা একান্ত আপনার ভেবে সেবা করত। আগুন জ্বালাবার কাঠ, চাল-ডাল বাড়ি থেকে এনে দিত। নর্মদা-মার জল ভরে দিত মাটির পাত্রে। পরিক্রমাবাসীরা তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হত। ভাবত এরাই মা নর্মদার যথার্থ সন্তান।

সাধুদের তপস্যা দেখে মিহিরাও সকাল সন্ধ্যায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকত। কী যে পেত কে জানে! একদিন চুপ করে দেখছিল তরঙ্গে উচ্ছল নর্মদা-মাকে। হঠাৎ দেখল জল থেকে উঠছে উজ্জ্বল আলোর ধারা। তার মাঝে ত্রিশূল হাতে এক বালিকা। সে যেন স্বপ্নের ঘোরে ছিল। নর্মদার আলোকধারা ক্রমে উজ্জ্বলতর। তাকে ঘিরে সেই জ্যোতি অমৃতবর্ষণ করল তার জিহ্বায়। এক দিব্য আনন্দে ভরিয়ে দিল হৃদয় ও মন। মায়ের মূর্তি মিলিয়ে গেল জলের স্রোতে। যেন গলে মিশে এক হল। মিহিরারও ঘরের বাঁধন খুলে গেল। তার জীবন হল মাতৃময়। জলময়ী মা তার তনু আশ্রয় করে অবিরাম অমৃতবর্ষণ করে চললেন। তরুণ মিহিরার হৃদয় তখন ভরপুর, এবার জাগল তপস্যার প্রবল টান। তার মনপ্রাণ নর্মদার পবিত্র জলে ধৌত। সে ভাবল এই পুণ্যবারি দানেই তার তপস্যা বর্ধিত হবে, পথ পাবে, দিশা পাবে।

মনে গুনগুন করে উঠল ওঙ্কারেশ্বরের তীর্থকথা। মিহিরা চললেন। ওঙ্কারেশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর পথের অনেক উপরে পাতলেন আসন। এখানে শুধু ধ্যান নয়—তাঁর জন্য রইল পথিক, তীর্থযাত্রী, গ্রামবাসী—সকলের সেবাপূজা।

তাঁর দিনচর্যা ছিল বড় বিস্ময়কর। সাধনভজনের সঙ্গে ক্লান্ত শ্রান্ত পথিকের জন্য তাঁর অভিনব ব্যবস্থা। তিনি নিয়মিত ওপর থেকে নামতেন মা নর্মদার পুণ্যবারি সংগ্রহ করতে। কঠিন শ্রম করে বারবার ওঠানামা করে জলের জালাগুলি ভর্তি করে রাখতেন। ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দিরেও তাঁকে দেখা

যেত না। জীবই যেন তাঁর চোখে শিব—জীবের সেবাই তাঁর সাধন। এই সাধুর মুখে যেন কী দিব্য প্রসন্নতা! যারাই তাঁর ওই ছোট্ট কুটিরের সামনে দাঁড়ায়, তাদের নর্মদার জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে দেন—অন্নসত্র নয় জলসত্র—পিপাসার বারি। এমনই সেবা চলে সারা বছর। শুধু কেউ জানে না তিনি কী খান, ভিক্ষান্ন কোথায় পান।

বছরে একবার শুধু তিনি ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে দীর্ঘ প্রণতি জানাতে নামেন। সেইদিনটির জন্য ওঙ্কারেশ্বরের সমস্ত মানুষ অপেক্ষা করে। তিনি সকলকেই খাওয়ান পরম সমাদরে। বাজারে একটি বড় দোকান—সেই দোকানেই তিনি সব খাবার তৈরির জন্য টাকা দেন—দরদস্তুর করেন না কোনওদিন। সেখানকার মানুষ দরিদ্র, তারা মহানন্দে সেই আহার গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়। সাধু নিঃশব্দে বসে দেখেন। তাঁর চোখে ঝরে তৃপ্তির আনন্দ। মা নর্মদার তীরে এই ভোজন উৎসবের আকার নেয়। মা নর্মদাও আনন্দে ঢেউ তুলে যেন মেতে ওঠেন। সকলের খাওয়া হলে সাধু চলে যান ওপরে। সেখানকার ছোট-বড় সব ছেলেই সাধুবাবাকে চেনে, ভালবাসে। এমনি করেই ওই নিঃসম্বল সাধু সেবা করেন দরিদ্রদের। টাকা তিনি কোথায় কেমন করে পান তা কেউ জানে না। অনেকে ভাবে তাঁর বোধহয় অনেক টাকা সঞ্চিত আছে। ওঙ্কারেশ্বরের কয়েকটি বালক-যুবক ইতিমধ্যেই তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েছে। তারা জল তুলে সাহায্যও করে।

সেবারও সকলকে ভোজন করাবেন বলে দুটি বালক সহ তিনি নেমেছেন। ওঙ্কারেশ্বর মন্দির হয়ে দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানি হঠাৎ বলে, গতবারের সব টাকা সে পায়নি। সেই টাকা মিটিয়ে দিলে তবে সে এবারের আয়োজনে হাত দেবে।

মুহূর্তে সাধুর মুখ লাল হয়ে ওঠে। মিথ্যাভাষীর দোকান থেকে তিনি কিছুই নিলেন না। বালকদের বললেন আর একটি দোকান থেকে বড় বড় পাত্র সংগ্রহ করতে। পাত্র নিয়ে স্থানীয় একটি ছোট ঘর ভাড়া করেন। পাত্রগুলি রাখান। খাওয়ার সময় একটু পিছিয়ে দিয়ে সাধুবাবা ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানে বসেন। ছেলে দুটিও বাইরে বসে অপেক্ষা করে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সাধুবাবা সকলকে জড়ো করতে বলেন। রান্নার সুগন্ধে আকৃষ্ট ছেলে দুটি উঁকি মেরে দেখে, পাত্রগুলি সব নানা ব্যঞ্জনে, মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ। মা নর্মদার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, তাঁর কঙ্কর হয় শঙ্কর—এই অনুভব হয় দুটি ছেলের। তারা দেখল এক প্রেমিক সাধুকে, যিনি তপস্যা করেন জীবের জন্য!

সকলে ভরপেট খেয়ে সাধুবাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। তিনি তখন পূর্বোক্ত দোকানির কাছে গিয়ে বললেন তাঁর সঙ্গে তাঁর কুটিরে যেতে। সে ভীত, তবু তাঁর সঙ্গে চলল। গিয়ে দেখে একটা কম্বল আর জলপাত্রগুলি ছাড়া কিছুই নেই। তিনি ওই লোভী দোকানিকে একটি গাছ দেখিয়ে টাকা চাইতে বললেন। কী আশ্চর্য! গাছের কোটর থেকে ঝরঝর করে টাকা ঝরছে! বৃক্ষদেবতা চিরকালই পরোপকারী—ফুল-ফল-ডাল-পাতা-ছায়া বিছিয়ে মানুষের সেবা করেন। এবার তিনি সাধুর তপোবলে অর্থদাতা! সাধুবাবার চোখমুখ রক্তবর্ণ। গম্ভীর গলায় বললেন—তোমার যা বাকি আছে বলছ, নিয়ে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।

টাকা নিয়ে দোকানি সাধুর রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে দৌড়ে পালাল। ছেলে দুটিও হতভম্ব। ওদিকে দেখে সাধু দরাজ গলায় গাইছেন—"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং/ নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।"

পরদিন ছেলে দুটি জল ভরতে আসে। দেখে সাধুবাবা নেই। নামযশের ভয়ে এতদিনের আস্তানা ছেড়ে চলে গেছেন। যশ তাঁর কাছে শূকরীবিষ্ঠা।

নাঃ, কোথাও আর সাধুকে দেখা যায়নি। ওঙ্কারেশ্বর ছেড়ে কোন গহিনে সাধনসেবার আসন পেতেছেন একান্তে কে জানে!